ঘড়ি ধরে ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ নয়

জহর সরকার

ভারতের অসামান্য বৈচিত্রের উৎকৃষ্টতম প্রমাণ হল এত রকমের ক্যালেন্ডার এবং ‘নববর্ষ’। বহু ভাষা এবং সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে একে অন্যের সঙ্গে মিলেছে, তাদের উপর কোনও একমাত্রিক তকমা চাপিয়ে দেওয়া যায়নি। কিন্তু আমরা দেখব, এই বহু ‘নববর্ষ’-এর বৈচিত্রের মধ্যে ক্রমশ একটা ঐক্যের ধারণা তৈরি হয়েছে।

গুজরাতের মতো অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে দেখা যাবে, অন্য সব অঞ্চলেই নতুন বছর পালন করা হয় একটা নির্দিষ্ট সময়পর্বে: হোলি থেকে শুরু করে বৈশাখের প্রথম কয়েক দিন পর্যন্ত এই পর্বটি মোটামুটি তিন থেকে ছয় সপ্তাহে বিস্তৃত। গাঙ্গেয় অববাহিকা ও মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, ঝাড়খণ্ডে হোলিকে ‘ধর্মীয় বছর’-এর সূচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, আর মহাবিষুবের সময়কালীন শক সম্বৎকে ধরা হয় সরকারি নববর্ষ। এক শতকেরও বেশি আগে এম এম আন্ডারহিল তাঁর দ্য হিন্দু রিলিজিয়াস ইয়ার গ্রন্থে লিখেছিলেন, ‘হিন্দুদের কয়েক ধরনের বছর আছে, তবে অধিকাংশই দুটির মধ্যে কোনও একটি অনুসরণ করেন।’ তিনি শক এবং বিক্রম সম্বতের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাদের নতুন বছর সূচনার দিন পরস্পরের খুব কাছাকাছি, এবং পরের একশো বছের দেখা গেল, বেশির ভাগ রাজ্যেই বর্ষগণনা শুরু হয় চৈত্রের শুরুতে, মহাবিষুব থেকে বা এপ্রিলের মাঝামাঝি ‘বৈশাখী’ হিসেবে। অর্থাৎ কোনও একটি নির্ধারিত দিন না থাকলেও, একশো কোটির বেশি ভারতবাসী দুটি দিনের মধ্যে কোনও একটিতে নববর্ষ পালন করেন। এটা চমকপ্রদ নয়?

প্রথম দিনটি হল মহাবিষুব বা চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ। মরাঠিদের এ দিন গুড় পড়ওয়া, কান্নাডিগা এবং তেলুগুদের উগাড়ি বা যুগ-আদি, সিন্ধিদের চেইতি চাঁদ, পার্সি ও কাশ্মীরিদের নওরোজ এবং ঐতিহ্যনিষ্ঠ মাড়োয়ারিদের ঠাপনা। হিমাচলিরা এই দিনটিকে চৈত্তি এবং শিখরা নানকশাহি নববর্ষ হিসেবে পালন করেন বটে, তবে এই দুই জনগোষ্ঠীই অনেক বেশি ধুমধাম করেন ‘বৈশাখী’তে। মোটামুটি বলা চলে, ভারতের প্রায় অর্ধেক অংশে— উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের উপরিভাগে— নববর্ষ পালিত হয় মার্চ মাসে, আর বাঙালি সহ বাকি ভারতবাসী নতুন বছর শুরু করেন বৈশাখ মাসে। এর সঙ্গে রবি মরসুমের ফসল তোলার সংযোগ আছে। মহারাষ্ট্রে ও দাক্ষিণাত্যের উপরিভাগে মার্চ মাসের মধ্যে ফসল পেকে ওঠে, অন্যত্র এপ্রিল অবধি অপেক্ষা করতে হয়। নববর্ষের লগ্নও সেই অনুসারে স্থির হয়।

বাংলায় আসা যাক। ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা শশাঙ্কের আমলে সূর্যসিদ্ধান্তমতে পয়লা বৈশাখ পালন শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথাকে জনপ্রিয় করে তোলেন মুঘল সম্রাট আকবর এবং তাঁর জ্যোতির্বিদ ফতেউল্লাহ্ শিরাজি। চান্দ্রমতে নির্ধারিত হিজরি ক্যালেন্ডার দিয়ে কৃষির ফসল তোলার সময়ের হিসেব রাখা কঠিন ছিল, ফলে খাজনা তোলার সুবিধের জন্য একটা নতুন ক্যালেন্ডারের প্রবতর্ন হল: ফস্‌লি সন বা তারিখ-ই-ল্‌হালি। এটি ছিল সৌর ও চান্দ্র গণনার সংমিশ্রণ। ধর্ম ও সংস্কৃতির আড়ালে থাকে অর্থনীতি। প্রসঙ্গত, মধ্যুগে আমাদের মঙ্গলকাবে॥ প্রধান ভূমিকা ছিল সওদাগরদের, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈদ॥ ভদ্রলোকদের দাপট দেখা দিল মুঘল যুগের সেষের দিকে, আরও বেশি করে ব্রিটিশ আমলে। তখন তাঁদের সেই দাপটের সামনে স্থানীয় বণিকদের সামাজিক ভূমিকা এতটাই খাটো হয়ে গেল যে, অন্য প্রদেশের ব্যবসায়ীরা এই অঞ্চলে প্রতিপত্তি বিস্তার করলেন। বাঙালি উদ্যোগপতিদের অবস্থান আরও নীচে নামল। হালখাতার দোকানের সামনে ভিড় বাড়িয়ে এই হৃতগৌরব ফেরানো অসম্ভব। তবে বাংলাদেশে এখন নববর্ষ অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে উদ্‌যাপিত হয়। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা না-হয় এই পবিত্র বৈশাখ মাসটিতে বিবাহ ও অন্য নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনেই ব্যস্ত থাকি।

প্রতিবেশী অসমে বর্ষশেষের দিনটিতে পালিত হয় ‘গরু বিহু’। গরুদের হলুদ ইত্যাদি মাখিয়ে স্নান করানো হয়। নতুন বছর শুরু হয় রংগালি বা বোহাগ বিহু দিয়ে, অনুষ্ঠান চলে মাসভ’র। এই উৎসবে তিনটি বড় সংস্কৃতির ধারা এসে মিশে যায়: চিনা-বর্মী, ইন্দো-এরিয়ান এবং অস্ট্রো-এশিয়াটিক। কৃষি এবং উর্বরতার সঙ্গে গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট এই বিশু বা বিহু উৎসব তরুণতরুণীদের সুসজ্জিত হয়ে যোগ দেওয়ার আহ্বান

জানায়, তাঁরা বিহুগানের সুরে সারা দেহে হিল্লোল তুলে নাচে মেতে ওঠেন।

বাংলার আর এক প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশাও এই দিনেই মহাবিষুব সংক্রান্তি পালন করে। এর আর এক নাম পান সংক্রান্তি— বেল ও অন॥ নানা ফল, দই, পনীর এবং আরও বিভিন্ন উপকরণ মিশিয়ে চমৎকার পানীয় তৈরি হয় এই সময়। পবিত্র তুলসী গাছের উপর একটি পাত্র ঝোলানো হয়, তার নীচে থাকে একটি ছোট্ট ফুটো, সেই পাত্রে এই পানীয় থাকে, তা ফোঁটায় ফোঁটায় তুলসী গাছকে পুষ্টি দেয়। ওড়িশায় আরও নানা যাত্রার মাধ্যমে এই তিথির উদ্‌যাপন চলে, যেমন ঝামু, পটুয়া, হিংগুলা, দণ্ড ইত্যাদি। প্রত্যেকটির আছে নিজস্ব রীতি, নিজস্ব রং।

হাজার মাইল পার হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে পৌঁছলে দেখব, কেরলে বিশু পালিত হয় বিপুল আলোকসজ্জায় ও আতসবাজিতে। বর্ষারম্ভের শুভারম্ভ ‘কানি’ উদ্‌যাপন শুরু হয় আগের রাত্রিতে, চিরাচরিত প্রথায় বিশুক্কানি সাজানোর মধ্য দিয়ে, তাতে রাখা হয় নানান শুভসূচক সামগ্রী: টাকাকড়ি, গয়নাগাটি, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, প্রদীপ, চাল, ফল, পান, সুপারি, কলা, তরিতরকারি, লেবু, ধাতব দর্পণ, হলুদ রঙের কোন্না ফুল ইত্যাদি। ভোজের আয়োজন হবেই, তার সঙ্গে থাকা চাই চাল, নারকেলের দুধ আর মশলাপাতি দিয়ে তৈরি কাঞ্জি, এবং চাই বিশু কাট্টা চালের পিঠে ও টক-মিষ্টি আমের সরবত।

তামিলনাড়ুতে এবং দুনিয়ার সর্বত্র তামিলভাষী মানুষের মধ্যে ১৪ এপ্রিল পুটন্ডু অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নববর্ষের সূচনা হয়, সবাইকে শুভসূচক সামগ্রী প্রথম দর্শন করতে হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেমন, তেমনই তামিলনাড়ুতেও এই দিনে পুণ্যস্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করতে হয়, বাড়িতে ঘরে ঘরে ফুলপাতার মতো নকশায় মনোহর বহুবর্ণ আলপনা দেওয়া হয়, যার নাম কোল্লম। কর্নাটকে উগাড়ি আসে মার্চ মাসে, সেখানেও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে টুলু ও কোড়াগুরা বিশু উদ্যাপন করেন এবং মধ্য-এপ্রিলে কানির শুভাচারগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রথা ও সংস্কৃতিকে একটা ছকে নিয়ে আসা অসম্ভব, কিন্তু ভাল করে বিচার করলে কতকগুলো সামগ্রিক যোগসূত্র পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ এবং নেপালে নববর্ষ পালন করা হয় প্রধানত বৈশাখে, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও এই সময়েই ধর্মীয় আবেগে ‘বৈশাখী’ উদ্যাপিত হয়। লাওস-এ এপ্রিলের মাঝামাঝি পড়ে সোংক্রান, কথাটা এসেছে ‘সংক্রান্তি’ থেকে। মানুষ শুচিস্নান করে শুচিবস্ত্র পরিধান করে বৌদ্ধ মন্দিরে যান, শ্রমণদের শ্রদ্ধা জানান। তাইল্যান্ডেও প্রায় একই নাম এই উত্‌সবের: সোংক্রান, আচার-অনুষ্ঠানও প্রায় একই। দু’দেশেই ‘জলের লড়াই’ হয়, মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসে পরস্পরকে জলে ভিজিয়ে দিতে থাকেন, সে জন্য বালতি থেকে হোসপাইপ, সব কিছুই ব্যবহার করা হয়। কাম্বোডিয়াতে এই সময় অনুষ্ঠিত হয় মহা-সোংক্রান। এই সময়টাতে এই তিন দেশেই প্রচণ্ড গরম পড়ে, তাই সবাই জলে ভিজতে খুবই পছন্দ করেন। তবে এই দেশগুলিতে এই সময় দুটি ব্যাপার দেখা যায়, যা বিশেষ তাত্‌পর্যপূর্ণ, এক, বয়স্ক মানুষদের সম্মান জানানো এবং দুই, বন্দি প্রাণীদের মুক্তি দেওয়া, সে প্রাণী ছোট মাছ হতে পারে, কিংবা পাখি, অথবা কচ্ছপ। এটা একটা বৌদ্ধ প্রথা। আর একটি প্রথা হল অভাবী মানুষদের ভিক্ষা দান করা, ভারতীয়রা যা থেকে শিখতে পারেন।

মায়ানমারে এ সময় অনুষ্ঠিত হয় ‘থিঙ্গিয়ান’, একই ধরনের বৌদ্ধ আচার পালিত হয়। সমস্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শেষ হলে সন্ধ্যাবেলায় মানুষ নাচগানে মেতে ওঠেন এবং পরের দিনের জলের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হন। শ্রীলঙ্কায় মীনরাশি থেকে মেষরাশিতে পরিবর্তনের এই সময়টাতে অলুথ-আভুরুড্ডা পালিত হয় প্রবল নিষ্ঠায়, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে ‘কানি’র মতো দ্রাবিড় রীতিগুলিও অনুসৃত হয়, কারণ এটাই ব্যবসা ও অন্যান্য উদ্যোগ সূচনার প্রশস্ত সময়।

সাহেবি কেতায় ঘড়ির কাঁটা ধরে ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’-এ অভ্যস্ত হয়েছি আমরা। ভারত এবং প্রতিবেশী নানা দেশের দিকে তাকিয়ে দেখলে বুঝতে পারি, এই ছক-বাঁধা সেলিব্রেশনের বাইরে কী ভাবে বহু রং, বহু রীতি এবং বহু রূপে বহু নববর্ষের মালা গাঁথা হতে পারে। ভারতের বৈচিত্রের স্বরূপটাও অনুধাবন করতে পারি।

প্রসার ভারতীর কর্ণধার, মতামত ব্যক্তিগত